Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks

Ministry of Industries

THE GEOGRAPHICAL INDICATION (GI) JOURNAL

"সিরাজগঞ্জের গামছা"

GI Journal No. 39

Published on : 30 JUN 2024

পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
ডকেট নং- তাং-
(ক) পরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
(খ) পরিচালক (পেঃ ও ডিঃ)
(গ) পরিচালক (ট্রেডমার্কস)
(ঘ) পরিচালক (ডাব্লিউটিও)
(ঙ) পরিচালক (জি আই)
(চ) সিস্টেম এনালিস্ট
(ছ) উপপরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
মহাপরিচালক

www.dpdt.gov.bd

Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks
Shilpa Bhaban, 91 Motijheel, Dhaka, Bangladesh

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি

১। আবেদনপত্র ঃ

(১) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফিসহ এক শ্রেণির পণ্যের জন্য জিআই ফরম-০১ এবং একাধিক শ্রেণির পণ্যের জন্য জিআই ফরম-০২ এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রতিটি আবেদনপত্র আবেদনকারী তারিখ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) প্রতিটি আবেদনপত্রের তিন কপির সহিত অতিরিক্ত পাঁচ কপি প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের পাঁচটি নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

২। ফি ঃ

(১) ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে তফসিল-০১ এ উল্লিখিত ফি অনুসারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) ফি মহাপরিচালক বরাবর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের জন্য ফি প্রদেয়, সেই ক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতিরেকে বা অপর্যাপ্ত ফি পরিশোধ করা হইলে, উক্তরূপ দলিলাদি বিধিসম্মতভাবে দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩। ভাষা ঃ

(১) সকল আবেদনপত্র বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখিত হইতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের কাগজ ও কালি পাঠযোগ্য, টেকসই, স্থায়ী প্রকৃতির ও উন্নতমানের হইতে হইবে।

৪। আবেদনপত্রে স্বাক্ষর ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের আবেদনপত্র এবং অন্যান্য দলিল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) ব্যক্তিসংঘ বা উৎপাদনকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি :

(খ) কোন কর্পোরেট বডি, আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ বডি বা সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা সচিব অথবা প্রধান কর্মকর্তা ;

(২) স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরের নিম্নে-

(ক) তাহার পদবি বা পদমর্যাদা ; এবং

(খ) বাংলা বর্ণে অথবা বড় হাতের ইংরেজি বর্ণে, তাহার পূর্ণাঙ্গ নাম ; স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। আবেদনপত্রে ব্যবহারকারীর বিবৃতি ঃ

কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অথবা পণ্যের বৈধ ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে পণ্যটি কোন সময়কাল হইতে কাহার দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি বিবরণী থাকিতে হইবে।

৬। আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদি ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত একটি বিবৃতি-

(অ) পণ্যটি উৎপাদিত হইবার সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকা ;

(আ) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা ক্ষেত্রমত, এলাকায় উৎপাদিত হইবার ফলে পণ্যটিতে নিহিত সুনাম, গুণাগুণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্য ;

(ই) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকা সম্পর্কিত বিশেষ ভৌগোলিক আবহাওয়া, সহজাত প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়াদি যাহা পণ্যটিকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে ; এবং

(ঈ) উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎস ;

(খ) যে শ্রেণির পণ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক প্রযোজ্য হইবে উহার নাম ;

(গ) পণ্য উৎপাদনকারী দেশের নির্দিষ্ট যে অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় পণ্যটি উৎপাদিত হয় উহার মানচিত্র ;

(ঘ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহকে নির্দেশ করে এমন কোন শব্দ বা চিহ্ন ;

(ঙ) নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির উৎপাদনকারীগণ সম্পর্কিত বিবরণ ;

(চ) আবেদনকারী কিভাবে আইনের অধীন গঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসংঘ, উৎপাদনকারীগণের সংগঠন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎমর্মে একটি হলফনামা ;

(ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কোন বিশেষ "স্ট্যান্ডার্ড বেঞ্চমার্ক" অথবা উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কিত "শিল্প মানদণ্ড" থাকিলে তৎসম্পর্কিত দলিলাদি ;

(জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মান, গুণাগুণ, মানের ধারাবাহিকতা বা বিশেষত্ব বজায় রাখিবার বা নিশ্চিৎকরণের জন্য পণ্যটির উৎপাদনকারী, কারিগর বা প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রয়োগকৃত পদ্ধতি (mechanism) সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ঝ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকার মানচিত্রের (মানচিত্র প্রকাশকের পদবি, নাম ও ইস্যুর তারিখ উল্লেখক্রমে) তিনটি প্রত্যায়িত কপি ;

(ঞ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট বিশেষ মানবিক দক্ষতা, ভৌগোলিক জলবায়ুর অনন্যতা অথবা অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ট) সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারীগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিসংঘ, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ;

(ঠ) আবেদনে উল্লিখিত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় সংশ্লিষ্ট পণ্যটির ক্ষেত্রে আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকিলে উহার বিবরণ ; এবং

(ড) আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইতোমধ্যে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সমনামীয় হইলে, আবেদনাধীন পণ্য ও ইতোমধ্যে নিবন্ধিত পণ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ এবং প্রতারণা বা ভোক্তাগণের বিভ্রান্তি রোধে গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ।

৭। **কনভেনশনভুক্ত ব্যবস্থার অধীন আবেদন ঃ**

(১) কনভেনশনভুক্ত কোন রাষ্ট্রের একজন আবেদনকারী কর্তৃক কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইলে উক্তরূপ আবেদনপত্রের সহিত কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অফিস যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত সনদপত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিস্তারিত বিবরণসহ আবেদনপত্রটি দাখিলের তারিখ, রাষ্ট্রের নাম, কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে পণ্যটি প্রথম নিবন্ধনের তারিখ এবং মহাপরিচালক কর্তৃক চাহিত অন্যান্য বিষয়াদির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে নিবন্ধনের আবেদন করিবার সময় উক্তরূপ সনদ উপস্থাপন না করা হয়, সেইক্ষেত্রে আবেদন করিবার ২(দুই) মাসের মধ্যে মহাপরিচালকের সন্তুষ্টি অনুযায়ী আবেদনটি পেশ করিবার তারিখ, উহার রাষ্ট্রের নাম, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিবরণ, আবেদনপত্রে উল্লিখিত শ্রেণি এবং পণ্য সম্বলিত তথ্যাদি প্রত্যয়ন ও সত্যায়নপূর্বক পেশ করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রটি একই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য এবং আবেদনপত্রের অধীন সকল অথবা আংশিক পণ্যের জন্য কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে আবেদনকারীর প্রথম আবেদন হইতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র হইতে এক বা একাধিক শ্রেণির ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য একটিমাত্র আবেদনপত্র দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদন নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

৮। আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার ঃ

(১) আবেদনপত্রের নম্বর ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম উল্লেখপূর্বক মহাপরিচালক প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করিবেন।

৯। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

প্রতিটি আবেদনপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় দাখিল করিতে হইবে :

মহাপরিচালক
পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯৫৬০৬৯৬
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৫৫৬৫৫৬
ই-মেইল ঃ dg@dpdt.gov.bd
Web: www.dpdt.gov.bd

ভৌগোলিক নির্দেশক আবেদন নং-৬৫

আবেদনের তারিখ : ০৬-০৩-২০২৪ খ্রিঃ

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য **"সিরাজগঞ্জের গামছা"** যা শ্রেণি ২৪ এ অন্তর্ভুক্ত, তা নিবন্ধনের জন্য ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ অনুসারে জার্নালে প্রকাশ করা হলো।

ভৌগোলিক নির্দেশকের নাম ঃ **"সিরাজগঞ্জের গামছা"**

শ্রেণি ঃ ২৪

ক) **আবেদনকারীর নাম** ঃ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তাত বোর্ড।

খ) **ঠিকানা** ঃ বিটিএমসি ভবন (৫ম তলা), ৭-৯ কাওরান বাজার, ঢাকা।

গ) **ব্যক্তি/উৎপাদক/ব্যক্তিবর্গ/সংগঠন/উৎপাদকের সংগঠন/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের তালিকা ঃ উৎপাদনকারীগণের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে তালিকায় আরও উৎপাদনকারীর নাম সংযোজিত হতে পারে।**

ঘ) **প্রকার** ঃ সিরাজগঞ্জের গামছা (২৪)

ঙ) **স্পেসিফিকেশন** ঃ

গামছা শব্দটি এসেছে বাংলা গা মোছা শব্দ থেকে। অর্থাৎ গা মোছার ছোট বস্ত্রের নামই গামছা। গামছা পাতলা ও অমসৃণ সুতি বস্ত্র বিশেষ, যা আদি কাল হতে বাংলাদেশে ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ইংরেজি অভিধানে গামছাকে বলা হয় "A napkin made by handloom" এর অর্থ হল হস্তচালিত তাঁতে তৈরি ন্যাপকিন। 'সিরাজগঞ্জের গামছা' এর সাধারণ স্পেসিফিকেশন নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১। গামছার দৈর্ঘ্য	:	০.৭০ - ২.২৯ মি.
২। গামছার বহর	:	০.৩৫ - ১.১০ মি.
৩। টানা সুতার ধরন	:	১০০% কটন (সিঙ্গেল)
৪। টানা সুতার কাউন্ট	:	৩০স - ৫০স ইংলিশ কাউন্ট
৫। পড়েন সুতার ধরন	:	১০০% কটন (সিঙ্গেল)
৬। পড়েন সুতার কাউন্ট	:	কটন: ২০স - ৫০স ইংলিশ কাউন্ট
৭। সানার নম্বর	:	৪২-৭০ নম্বর (স্টোক পোর্ট পদ্ধতি)
৮। ঝাঁপ সংখ্যা	:	০২
৯। এন্ডস/ইঞ্চিঃ	:	৪২-৭০
১০। পিকস/ইঞ্চিঃ	:	৪২-৭০
১১। উইভ স্ট্রাকচার	:	পেইন (১ আপ, ১ ডাউন)
১২। ডিজাইন	:	চেক ও স্ট্রাইপ

পণ্যের নমুনার ছবি

নমুনা-১	
নমুনা-২	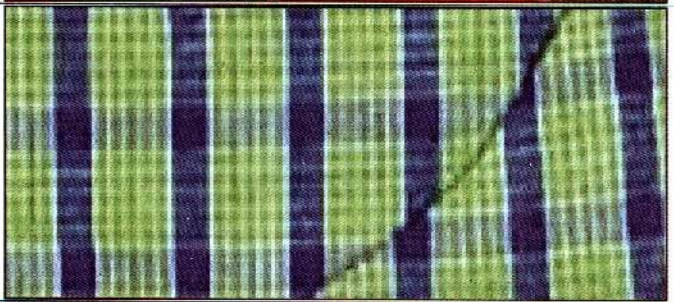
নমুনা-৩	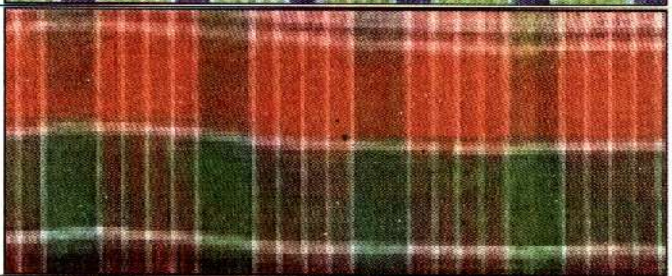
নমুনা-৪	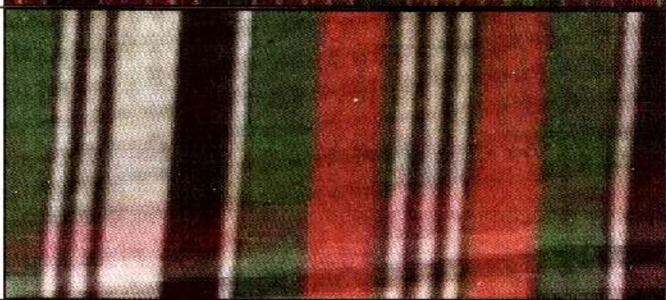
নমুনা-৫	

চ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের বর্ণনা ঃ

(ক) ভূমিকা :

গামছা শব্দটি এসেছে বাংলা গা মোছা শব্দ থেকে। অর্থাৎ গা মোছার ছোট বস্ত্রের নামই গামছা। গামছা পাতলা ও অমসৃণ সুতি বস্ত্র বিশেষ, যা আদি কাল হতে বাংলাদেশে ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ইংরেজি অভিধানে গামছাকে বলা হয় "A napkin made by handloom"। এর অর্থ হল হস্তচালিত তাঁতে তৈরি ন্যাপকিন।

পল্লী কবি জসিম উদ্দিন এর 'আমার বাড়ি' কবিতায় গামছার উল্লেখ আছে নিম্নরূপভাবে ঃ

আমার বাড়ি যাইও ভোমর,
বসতে দেব পিঁড়ে,
জলপান যে করতে দেব
শালি ধানের চিঁড়ে।
শালি ধানের চিঁড়ে দেব,
বিন্নি ধানের খই,
বাড়ির গাছের কবরী কলা
গামছা বাঁধা দই। ১

বাংলার লোক সংগীতেও গামছার উল্লেখ পাওয়া যায় নিম্নরূপভাবে-

'যদি বন্ধু যাবার চান
ঘাড়ের গামছা থুইয়া যাও রে...'

কাজল ভ্রমরা বন্ধু যখন নিধুয়া পাথারে গরুর গাড়ি নিয়ে ছুটে চলেছে দিনের পর দিন, তখন প্রিয়তমা আকুতি জানিয়ে বলছে, যেতে চাইলে যাও। শুধু ঘাড়ের গামছাটা রেখে যাও। সেটাই আমার কাছে থাক তোমার স্মৃতি হয়ে।

[খ] সিরাজগঞ্জের গামছা :

অতিপ্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলার বিভিন্ন এলাকায় গামছা উৎপাদিত হয়। সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন এলাকা বিশেষ করে সিরাজগঞ্জ সদর, উল্লাপাড়া ও কামারখন্দ উপজেলার গামছা উল্লেখযোগ্য। বিশেষ ধরনের এবং উৎকৃষ্ট মানের সুতা দিয়ে তৈরি হয় এই গামছা। এর ফলে এই গামছা ব্যবহারে আরামদায়ক নরম ও স্বাচ্ছন্দ্যময়। এই গামছা বুনার ধরন, রঙ, নকশা সবকিছু আলাদা। এই গামছা তৈরি করতেও তাই বিশেষ দক্ষতা লাগে। এ কারণে সিরাজগঞ্জের সকল উপজেলায় বিশেষভাবে তৈরি হস্তচালিত পিট তাঁত ও সেমি-অটোমেটিক তাঁতে সূক্ষ্ম বুনট ও বস্ত্রের নামই সিরাজগঞ্জের গামছা।

[গ] সিরাজগঞ্জের গামছার সাধারণ বৈশিষ্ট্য :

১। সিরাজগঞ্জের গামছার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো বুনন শৈলী, রং বিন্যাস, ডিজাইন এবং সর্বোপরি শিল্পীর নিজস্ব দক্ষতা ;

২। সিরাজগঞ্জের গামছা ১০০% কটন সুতা দ্বারা তৈরি হয়, যা দেখতে আকর্ষণীয় ও ব্যবহারে আরামদায়ক ;

৩। সিরাজগঞ্জের গামছার আয়তনের উপর বিভিন্ন দামের হয়ে থাকে ;

৪। নকশার বৈচিত্রতার সাথে সংগতি রেখে টানা ও পড়েন উভয় দিকে বিভিন্ন রং এর রঙিন সুতার সাহায্যে চেক ও স্ট্রাইপ ডিজাইন ফুটে ওঠে এবং

৫। গামছা সাধারণত উজ্জ্বল রং তথা লাল, নীল, হলুদ, সবুজ ইত্যাদি রংয়ের হয়ে থাকে।

[ঘ] সিরাজগঞ্জের গামছার শ্রেণি :

সিরাজগঞ্জের গামছাকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভাজন করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে দৈর্ঘ্যের উপর ভিত্তি করে, যেমন- ১.৫ হাত/২ হাত/৩ হাত/৩.৫ হাত/৪ হাত/৪.৫ হাত/৫ হাত, ইত্যাদি বিভাজন দেখা যায়। এছাড়া চেক ; স্ট্রাইপ; এক কালার; মাল্টি কালার ভিত্তিক বিভাজনও দেখা যায়। ব্যবহার ভিত্তিক, যেমন- কিচেন, ওয়াশ রুম, ইত্যাদি বিভাজনও দেখা যায়। অধিকন্তু বিভিন্ন উৎসব ভিত্তিক, যেমন- বিয়ের সময় হলুদ গামছা, ইত্যাদি বিভাজনও হয়ে থাকে।

[ঙ] সিরাজগঞ্জের গামছার কাঁচামাল: সুতি সুতা।

[চ] সিরাজগঞ্জের গামছার নকশা :

চেক হলো গামছার মূল নকশা। বর্তমানে স্ট্রাইপ নকশার গামছা জনপ্রিয়তা পেয়েছে। লাল, সবুজ, হলুদ ও সাদা এ রংগুলোই গামছার আদি রং। এগুলো দিয়ে বানানো হতো গামছার বিখ্যাত চৌখোপা চেক নকশা। এখন গামছার রঙে পরিবর্তন এসেছে বেশ খানিকটা। তাঁতিরা নিজেরাও বিভিন্ন রকম পরীক্ষা করে বৈচিত্রময় বিভিন্ন ধরনের গামছা তৈরি করছে। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় সিরাজগঞ্জের গামছার নকশা অতিপ্রাচীনকাল থেকে ব্যবহার হয়ে আসছে।

[ছ] সিরাজগঞ্জের গামছার ব্যবহার :

বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের ইতিহাস অতি প্রাচীন। এই শিল্পের সাথে জড়িত আছে এদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। আর তাঁত শিল্প সেই ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। দেশের সর্ববৃহৎ কুটির শিল্প বা লোকশিল্পও এটি। এদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে জড়িয়ে আছে লোকজ অনেক উপাদান। এর মধ্যে তাঁতে উৎপাদিত পণ্য ব্যবহার বাঙালি সংস্কৃতির একটি অংশ, যার মধ্যে গামছা অন্যতম। গামছা বাংগালীর জীবনের প্রায় সকল কাজেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। গোসলের পর গা-মুছা, মাছ ধরা, ঘাম মুছা, মাথায় পাগড়ি, মেয়েদের ওড়না, বিয়ের গাড়ি সাজানো, ঘর মুছা, আসবাবপত্র মুছা ইত্যাদি কাজে গামছা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তাছাড়া গামছাকে অনেক সময় লুঙ্গির বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

কৃষক যখন কৃষি কাজ করতে বাড়ি থেকে বের হয় তখন লাঙ্গল জোয়ালের সাথে একটি গামছা নিয়ে বের হন। যেটি সারাদিন কৃষকের ঘাম মোছা থেকে শুরু করে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়। দুপুরের খাবার গামছায় বেঁধে নেয়া হতো এবং ভাত খাবার সময় গামছা বিছিয়ে সেখানে বসে ভাত খাওয়া হয়। কৃষিতে যে শ্রমিক দিন মজুরীর কাজ করে তিনিও একটি গামছা সব সময় ব্যবহার করে। কাজ শেষে বিশ্রামের সময়ও গামছা দিয়ে একটু হাওয়া করে গা জুড়িয়ে নেয়। একসময় বিশেষ করে সিরাজগঞ্জের রাখাল বালকদের ঘাড়েও গামছা দেখতে পাওয়া যায়। মানুষ ভ্রমণের সময় অত্যাবশ্যক হিসেবে গামছা বহন করে নিয়ে যায়।

প্রায় সকল মিষ্টির দোকানে বিকাল বেলা দেখা যায় দুধ থেকে ছানা বের করার পর সেই ছানা থেকে পানি বের করার জন্য ছানা গামছায় বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এছাড়া পাকা তালের তরল অংশও গামছায় ঝুলিয়ে রাখা হয় যাতে করে তেতো অংশ ঝরে যায়। এখনো বাংলাদেশের বহু এলাকায় গ্রামের ছোট ছেলে মেয়েরা হাঁটুজলে গামছা পেতে মাছ ধরে। আগে গ্রামের মানুষেরা কোমরে গামছা বেধে পলো নিয়ে মাছ ধরতে নামত। অন্যদিকে জেলেরা রোদ-বৃষ্টি থেকে রেহাই পেতে গামছা ব্যবহার করে থাকে।

দৈনন্দিন বাঙালি জীবনের অন্যতম অনুসঙ্গ এই কাপড়টি চৈত্র-বৈশাখের কাঠ ফাঁটা রোদ আর প্রচণ্ড উত্তাপে ঘর্মাক্ত ক্লান্ত পথিককে শান্তির ছোঁয়া দিয়ে যায়। রোদেলা দুপুরে ফসলের মাঠে কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত কৃষক গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেন কাঁধের গামছাখানা পেতেই। এভাবে গ্রীষ্ম কিংবা বর্ষা, শরৎ কিংবা শীত সব ঋতুতেই গামছা ব্যবহার করে বাঙালি। যদিও কালের বিবর্তনে অনেকে গামছার পরিবর্তে তোয়ালে ও রুমাল ব্যবহার করলেও গামছার চাহিদা এতোটুকুও কমেনি।

ছ) উৎপাদনের ভৌগোলিক এলাকা ও মানচিত্র ঃ

সিরাজগঞ্জের গামছা উৎপাদন এলাকা/অঞ্চল: সমগ্র সিরাজগঞ্জ জেলা।

অধিক পরিমাণে সিরাজগঞ্জের গামছা উৎপাদন এলাকা: সিরাজগঞ্জ সদর, উল্লাপাড়া ও কামারখন্দ উপজেলা।

তুলনামূলক কম পরিমাণে সিরাজগঞ্জের গামছা উৎপাদন এলাকা: তারাশ, বেলকুচি, শাহজাদপুর ও রায়গঞ্জ উপজেলা।

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎপাদনের এলাকার মানচিত্র :

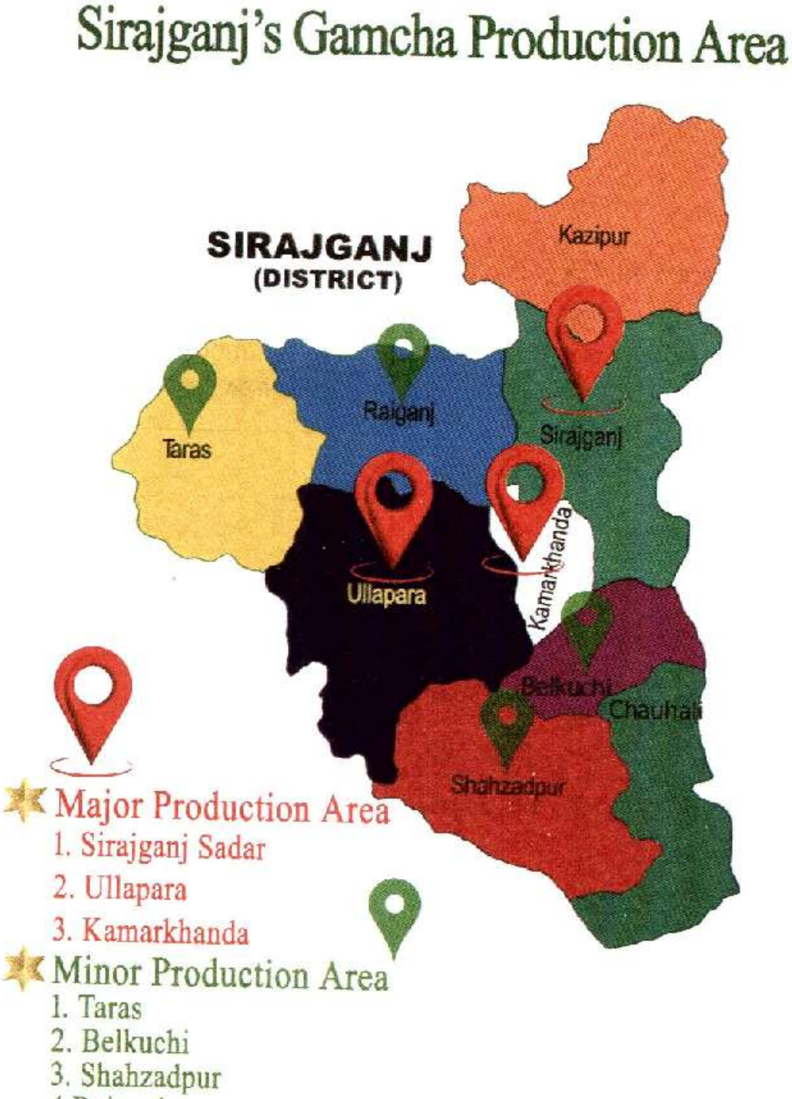

জ) উৎসের প্রমাণ (ঐতিহাসিক দলিলাদি) ঃ

বেলকুচি থানায় সিরাজউদ্দিন চৌধুরী নামক একজন ভূস্বামী (জমিদার) ছিলেন। তিনি তার নিজ মহালে একটি গঞ্জ স্থাপন করেন। তার নামানুসারে এর নামকরণ করা হয় সিরাজগঞ্জ। কিন্তু এটি ততটা প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। যমুনা নদীর ভাঙ্গনের ফলে ক্রমে তা নদীগর্ভে বিলীন হয় এবং ক্রমশ: উত্তর দিকে সরে আসে। সে সময় সিরাজউদ্দিন চৌধুরী ১৮০৯ সালের দিকে খয়রাতি মহল রূপে জমিদারি সেরেস্তায় লিখিত ভূতের দিয়ার মৌজা নিলামে ক্রয় করেন। তিনি এই স্থানটিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান স্থানরূপে বিশেষ সহায়ক মনে করেন। এমন সময় তার নামে নামকরণকৃত সিরাজগঞ্জ স্থানটি পুনরায় নদী ভাঙ্গনে বিলীন হয়। তিনি ভূতের দিয়ার মৌজাকেই নতুনভাবে সিরাজগঞ্জ নামে নামকরণ করেন। ফলে ভূতের দিয়ার মৌজাই সিরাজগঞ্জ নামে স্থায়ী রূপ লাভ করে।[২]

বাঙালিয়ানার নিদর্শন হিসেবে দেশীয় বাহারি গামছা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। দেশীয় বিভিন্ন উৎসবে বিশেষ করে ফাল্গুন, বৈশাখ, চৈত্র সংক্রান্তিতে বাঙালির কাছে কদর বাড়ে গামছার। তেমনি সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় তাঁতের তৈরি বাহারী রঙের হরেক রকমের গামছার সুনাম রয়েছে দেশজুড়ে। এখানকার তাঁতীদের উৎপাদিত গামছা কেনা বেচাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ৫টি বিশাল গামছার হাট. যেমন- সোহাগপুর, সিরাজগঞ্জ, এনায়েতপুর, শাহজাদপুর ও পাঁচিলা। দূর-দূরান্তের পাইকাররা এখান থেকে গামছা কিনে নিয়ে যাচ্ছে সারাদেশে। সিরাজগঞ্জের তাঁতীরা যুগ যুগ ধরে নানা প্রতিকূলতার মাঝেও এ শিল্পকে ধরে রেখেছে।

সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় গামছা তৈরি করে জীবন ও জীবিকা চলছে বহু তাঁতী পরিবারের। সিরাজগঞ্জের সদর, কামারখন্দ, উল্লাপাড়া, বেলকুচি, শাহজাদপুর, উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের পুরুষ ও নারী কারিগররা তাঁতে গামছা বুনে। সকাল থেকে রাত অবধি এখানকার গ্রামগুলোতে তাঁতীদের গামছা বুনোনের খট খট শব্দে মুখর থাকে অবিরত। সকাল থেকে রাত অবধি চলে এই গামছা বুনন কাজ। যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরায় তারা নিজ হাতে হরেক রকম সুতোয় এ গামছা বোনে। আবার কেউ কেউ শ্রমিক দিয়ে গামছা বোনে।

সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন এলাকার তাঁতীদের বোনা গামছা কেনা বেচাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে পাঁচিলা, বেলকুচি, এনায়েত-পুর, শাহজাদপুর ও সিরাজগঞ্জ সদরে বৃহৎ গামছার হাট এর মধ্যে সোহাগপুর, সিরাজগঞ্জ, এনায়েতপুর, শাহজাদপুর ও পাঁচিলার হাটটি সব চেয়ে বড়। ভোর থেকেই দুর দুরান্তের ক্রেতা বিক্রেতায় সরগম হয়ে ওঠে উল্লেখিত এলাকার গামছা হাট। তাঁতীরা সপ্তাহ জুড়ে গামছা বুনে হাট বারে এখানে এনে বিক্রি করে। বাড়ির পাশে হাট খুব সহজেই তাঁতীরা তাদের গামছা বিক্রি করে।

উল্লেখ্য, উল্লাপাড়া উপজেলার হাটিকুমরুল ইউনিয়নের পাঁচিল গামছা তৈরির জন্য প্রসিদ্ধ এলাকা। এখানে প্রায় প্রতি বাড়িতেই গামছা বুননের দৃশ্য দেখা যায়। নারীরা সুতায় রং দেয় ও চরকায় সুতা কাটে এবং পুরুষেরা সমান তালে তাঁত বোনে।[৪]

শত শত বছরের ঐতিহ্য এ দেশের 'গামছা'। গামছার ইতিহাস অনেক পুরোনো। তবে আজ থেকে প্রায় সোয়া পাঁচ'শ বছর আগে লিখিত 'মনসামঙ্গল' কাব্যের বিবাহ উপলক্ষ্যে বেহুলার সাজসজ্জা ও বিবাহ অনুষ্ঠান অংশে গামছার উল্লেখ পাওয়া যায়। সুকবি নারায়ণ দেব লিখেছিলেন,

'হেট মাথা হইয়া লখাই ডাহিন বামে চায়।
জয়ধরে লখাইর হাতে গামছা জোগায়।।
গামছা লইয়া ঔসদ লাগে মুছিবার।
কন্যা বরে তোলা তুলি হইল সাতবার।।'[৫]

সুতরাং গামছা যে আমাদের সুদীর্ঘ কালের যাপন অনুষঙ্গ, তা অনস্বীকার্য।

'মনসামঙ্গল' কাব্যে গামছার আরো উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন-ডিঙ্গাডুবির ফলে চাঁদ সদাগর উপকূলে উঠিলে-

"ব্রহ্ম দিজে শুণিয়া চান্দোর বচন।
ভাঙ্গা গামছার অর্দ্ধেক দিল ততক্ষণ।।'৫

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "আমাদের ছোট নদী" কবিতায় গামছার বিষয়ে উল্লেখ করেন,

"তীরে তীরে ছেলে মেয়ে নাহিবার কালে
গামছায় জল ভরি গায়ে তারা ঢালে।"

ড. আবদুল করিম রচিত 'ঢাকাই মসলিন' বই-এ গামছা বিষয়ে উল্লেখ করা আছে নিম্নরূপভাবে :

"গা মোছা থেকেই গামছা শব্দের উৎপত্তি। হাত, মুখ বা শরীর ধোওয়ার পর গা মোছার জন্য অর্থাৎ বর্তমান কালের তোয়ালে রূপে গামছা ব্যবহৃত হতো। বর্তমান কালেও গামছার প্রচলন আছে। এর দৈর্ঘ্য ৫ থেকে ৬ গজ এবং চওড়া পৌনে এক গজ থেকে দেড় গজ পর্যন্ত ছিল। সাধারণ লোকের টুপী এবং জামা, বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের জামা তৈরীর জন্য গামছা ব্যবহৃত হতো।"৬

সিরাজউদ্দিন চৌধুরী নামক একজন ভূস্বামী (জমিদার) ১৮০৯ সালের দিকে ভূতের দিয়ার মৌজাকেই সিরাজগঞ্জ নামে নামকরণ করেন। ফলে ভূতের দিয়ার মৌজাই সিরাজগঞ্জ নামে স্থায়ী রূপ লাভ করে। এ নামকরণের ফলে অনুমান করা যায়, সেখানে উৎপাদিত গামছা 'সিরাজগঞ্জের গামছা' নামে পরিচিতি পেতে থাকে; যা বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত বস্ত্র হিসেবে দেশে-বিদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

ঝ) উৎপাদন পদ্ধতি ঃ

সিরাজগঞ্জের গামছা তৈরির জন্য বিভিন্ন ধরনের সুতা স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করা হয়। প্রয়োজনে সংগৃহীত সুতা প্রসেস ও রং করা হয়। তারপর নানা ধাপ সম্পন্ন করে এসব সুতা দিয়ে সিরাজগঞ্জ এর গামছা বুনন করা হয়।

[ক] সিরাজেগঞ্জের গামছা তৈরির ধাপসমূহ :

সিরাজগঞ্জের গামছা তৈরির বিষয়টা পুরোপুরি কায়িক শ্রম নির্ভর হয়ে থাকে। সিরাজগঞ্জের গামছা তৈরির প্রয়োজনীয় ধাপ গুলো তাঁতিদের হাতে ধারাবাহিক ভাবে কার্যকর হয়ে থাকে। ধাপগুলো হলো :

১। কোরা সুতা সংগ্রহ করা (প্যাকেজ ফর্মে) ;
২। প্যাকেজ ফর্ম হতে সুতার হ্যাংক তৈরি করা ;
৩। সুতা বয়েল/ধৌত করা ;
৪। সুতা রং করা ;
৫। সুতায় মাড় প্রয়োগ করা (টানা সুতায় মাড় প্রয়োগ করে রোদে শুকাতে হয় এবং পড়েন সুতা রোদে শুকাতে হয় না) ;
৬। টানা সুতার ববিন তৈরিকরণ ;
৭। টানা সুতার ববিন ক্রিলে সাজানো ;
৮। ক্রিল হতে সুতা ওয়ার্পিং ড্রামে জড়ানো ;
৯। টানা সুতার বিম তৈরিকরণ ;

১০। 'ব' করণ;

১১। শানাকরণ;

১২। বিম তাঁতে স্থাপনকরণ;

১৩। গামছা বয়ন শুরুকরণ;

১৪। তাঁত হতে গামছা সংগ্রহ;

১৫। গামছা ইস্ত্রিকরণ ও বাজারজাত করা।

[খ] উৎপাদন পদ্ধতির বিবরণ :

স্থানীয় বাজার ও অন্যান্য স্থান হতে কোরা সুতা সংগ্রহ করে প্রথমে সুতার প্যাকেজ হতে নির্ধারিত দৈর্ঘ্যের হ্যাংক তৈরি করা হয়। অতঃপর সুতার হ্যাংকে বয়েল/ধৌত করে রং করার উপযোগী করা হয়। অতঃপর প্রয়োজনমত বিভিন্ন রং দ্বারা সুতা রঞ্জিত করা হয়। অতঃপর রঞ্জিত সুতায় মাড় প্রয়োগের উদ্দেশ্যে চাউল এর সাথে প্রয়েজনমত সাবুদানা ও তুঁতে মিশ্রিত করে ভাত রান্না করা হয় এবং উক্ত ভাতকে ভালোভাবে বেটে মন্ড তৈরি করা হয়। অতঃপর উক্ত ভাতের মন্ড হাতের সাহায্যে সুতায় প্রয়োগ করা হয়। প্রয়োজনে বারি দিয়ে সুতা টানা টান করা হয়। অতঃপর টানা সুতা রোদে শুকাতে হয় এবং পড়েন সুতা রোদে শুকানোর প্রয়োজন পড়ে না। অতঃপর পর্যায়ক্রমে টানা সুতার ববিন তৈরি করা হয়, উক্ত ববিন ক্রিলে সাজানো হয়, ক্রিল হতে সুতা ওয়ার্পিং ড্রামে জড়ানো হয়। অতঃপর টানা সুতার বিম প্রস্তুত করা হয়। অতঃপর পর্যায়ক্রমে 'ব' ও শানাকরণ করা হয়। অতঃপর চূড়ান্ত বিমকে তাঁতে স্থাপন করা হয়। অতঃপর তাঁতী গামছা বয়ন শুরু করেন এবং বয়ন শেষে তাঁত হতে গামছা সংগ্রহপূর্বক ইস্ত্রি করে বাজারজাত করা হয়।

গ] সিরাজগঞ্জের গামছা তৈরির তাঁতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ :

১. টানার বিম (নরদ), ২. ক্লোথ বিম (নাতা), ৩. দক্তি, ৪. সানা, ৫ 'ব' ৬. প্যাডেল (পা-দানি), ৭. মতিকাটা ৮. মাকু, ইত্যাদি।

[ঘ] উৎপাদন প্রক্রিয়ার স্থির চিত্র :

ছবি-০১: সুতার হ্যাংক।

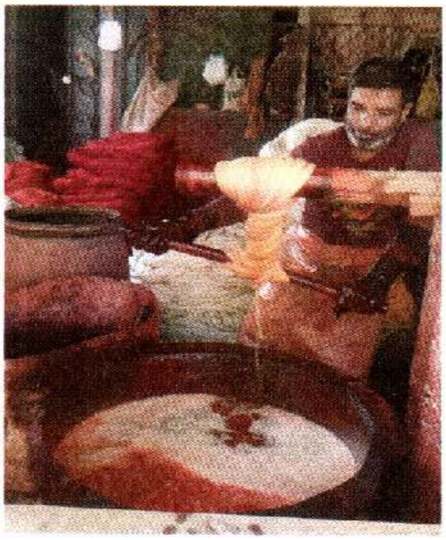

ছবি-০২: সুতা রংকরণ।

ছবি-০৩: রঙ্গিন সুতা রোদে শুকানো।

ছবি-০৪: সুতা ববিনকরণ।

ছবি-০৫: সুতা ওয়ার্পিং ড্রামে জড়ানো।

ছবি-০৬: টানার বিম।

ছবি-০৭: তাঁতে গামছা বুনন।

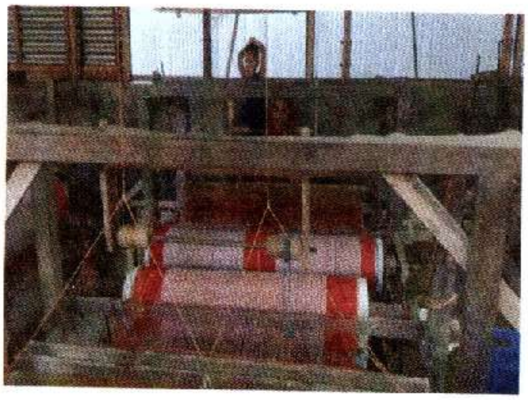

ছবি-০৮: তাঁতে গামছা বুনন।

ঞ) পণ্যের অনন্য বৈশিষ্ট্য ঃ

সিরাজগঞ্জের গামছা প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর টানা ও পড়েনে সিঙ্গেল সুতি সুতা ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া গামছার রং উজ্জ্বল ও পাকা হয়। ধোয়ার পর এর রং উঠে না। এ গামছা ব্যবহারে অত্যন্ত আরামদায়ক হয়। গামছার বুনন শৈলী, রং বিন্যাস ও ডিজাইনে তাঁতি শিল্পীর নিজস্ব দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। অধিকাংশ গামছাতেই দেখা যায় চেকের ব্যবহার। ধোয়ার পরও এই গামছা খাপে না বা ছোট হয়ে যায় না।

ট) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের ব্যবহারকাল ঃ

বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের ইতিহাস অতি প্রাচীন। এই শিল্পের সাথে জড়িত আছে এদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। আর তাঁত শিল্প সেই ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। দেশের সর্ববৃহৎ কুটির শিল্প বা লোকশিল্পও এটি। সিরাজগঞ্জ জেলার তাঁত শিল্প সেই সর্ববৃহৎ শিল্পের অন্যতম অংশীদার। প্রাচীনকাল থেকে সিরাজগঞ্জ এর দক্ষ কারিগররা তাদের বংশ পরম্পরায় তৈরি করেছেন নানা জাতের কাপড়। বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা ও হিউয়েন সাং-এর ভ্রমণ কাহিনীতে বাংলাদেশের বস্ত্র শিল্প অর্থাৎ তাঁত শিল্পের উল্লেখ রয়েছে।

মরক্কোর বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা (এয়োদশ-চতুর্দশ শতক) বাংলাদেশ সফর করেছিলেন। তিনি বাংলাদেশের তাঁত বস্ত্রের প্রশংসা করেছেন। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে তিনি বাংলাদেশে ত্রিশ কিউবিট (প্রাচীন পরিমাপক পদ্ধতি, হাতের দৈর্ঘ্যের উপড় নির্ভরশীল-এলাকাভেদে ভিন্নতা আছে) লম্বা মিহি সুতার তৈরি সুন্দর কাপড় মাত্র দুই দিনারে বিক্রির কথা উল্লেখ করেছেন।[৭]

আবার আরেক বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক মা হুয়েন পঞ্চদশ শতকে (১৪০৫) বাংলাদেশে এসেছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম, সোনারগাঁও বিভিন্ন শহর উল্লেখের পর গৌড়ের বিবরণ দিয়েছেন এভাবে যে, "এ দেশে ছয় প্রকারের সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হয়; এই বস্ত্র সাধারণত প্রস্থে দুই হাত এবং দৈর্ঘ্যে উনিশ হাত। এই দেশে রেশমের কীট পালিত হয় ও রেশম নির্মিত বস্ত্র বয়ন করা হয়।[৭]

চীনা সূত্র থেকে আমরা বাংলাদেশের যেসব সুতিবস্ত্রের নাম ও বিবরণ জানতে পারি, তা নিম্নরূপ:[৬]

পি-পো	এটা সুতি কাপড় এবং এটা নানা রঙের হয়। এটা দৈর্ঘে ছাপ্পান্ন ফুট এবং প্রস্থে তিন ফুট। এটা ছাপা কাপড়ের মতো মসৃণ।
মান-চে-টি	এটা আদার মতো হলুদ রঙের। দৈর্ঘে পঞ্চাশ ফুট এবং প্রস্থে চার ফুট। এটার বুনুনি অত্যন্ত মিহি ও শক্ত।
শা-না-পা-ফু	এটা দৈর্ঘে ত্রিশ ফুট এবং প্রস্থে পাঁচ ফুট।
কি-পাই-লি-তা-লি	এটা দৈর্ঘে ষাট ফুট এবং প্রস্থে তিন ফুট। এটা পাতলা বুনুনির মোটা কাপড়।
শা-তা-উল	এটা পাগড়ির জন্য ব্যবহৃত হতো। এটা দৈর্ঘে চল্লিশ ফুট এবং প্রস্থে পাঁচ ইঞ্চ ছিল বা দৈর্ঘে চার ফুট এবং প্রস্থে আড়াই ফুট ছিল।
মা-হা-মা-লি	এটা দৈর্ঘে বিশ ফুট এবং প্রস্থে চার ফুট।

ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ে (১৬২৪–৮৮) বাংলাদেশ সফর করেন ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি ছিলেন পরিব্রাজক ও মুঘল রাজদরবারের চিকিৎসক। তিনি লিখেছেন, "আমি মাঝে মাঝে বিপুল পরিমাণ সুতি বস্ত্র দেখে অবাক হতাম। এগুলি ছিল বিভিন্ন রকমের মিহি এবং মোটা, সাদা ও রঙ্গন। এসব বস্ত্র শুধু হল্যান্ডের অধিবাসীরাই বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে জাপান ও ইউরোপে রপ্তানি করত। ইংরেজ, পর্তুগিজ ও ভারতীয় বণিকেরা এসব পণ্যের প্রচুর ব্যবসা করত। লাহোর পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র মুঘল

সম্রাজ্য, কাবুল এবং সাধারণত যেসব বিদেশী জাতির কাছে সুতি বস্ত্র পাঠানো হতো, তা সরবরাহের জন্য প্রতি বছর বাংলা থেকে যে পরিমাণ সুতিবস্ত্র সংগ্রহ করা হতো তা কল্পনা করা সম্ভব নয় (I have been sometimes amazed at the vast quantity of cotton cloths, of every sort, fine and coarse, white and coloured, which the Hollanders alone export to different places, especially to Japan and Europe. The English, the Portuguese, and the native merchants deal also in these articles to a considerable extent. The same may be said of the silks and silk stuffs of all sorts. It is not possible to conceive the quantity drawn every zear from Bengale for the supply of the whole of the Mogol Empire, as far as Lahor and Cabol, and generally of all those foreign nations to which the cotton cloths are sent.) ।[৮]

দৈনিক যুগান্তরের ৮/৩/২০২২ ইং তারিখের প্রিন্ট সংস্করণে লেখক রীতা ভৌমিক 'তাঁত শিল্প এবং আমাদের বিবি রাসেল' প্রবন্ধে গামছা প্রসংগে উল্লেখ করেন "এ প্রসঙ্গে বিবি রাসেল বলেন, 'ছোটবেলা থেকেই গামছার ব্যবহার দেখে আসছি। বিভিন্ন ধরনের গামছা। এ গামছাই আমাকে স্বপ্ন দেখায় নতুন কিছু করার। সর্বস্তরের মানুষের কথা ভেবে পোশাকে গামছার ব্যবহার করি। সেইসঙ্গে এটিও আমাকে ভাবায়, বাংলাদেশের গামছা তাঁতিরা দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে। যারা আমাকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন, তাদেরও ভাগ্যের পরিবর্তন করতে হবে এ গামছা দিয়েই। তাঁতি, কুটির শিল্পীদের হাতের জাদু গামছাকে অন্যরূপে নিয়ে এলাম দেশ-বিদেশের মানুষের সামনে। তিন মাস পর পর গামছার নকশা, রঙে ভিন্নতা আনা হয়। শাড়ি, জামা, স্কার্ফ, ন্যাপকিন, সোফা কাভার, পর্দা, চুড়ি অর্থাৎ মাল্টিপারপাসে গামছাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। ১৯৯৫ সাল থেকে শুধু বাংলাদেশেই নয়, ইউরোপের দেশ স্পেন, ফ্রান্স, ইতালি, ল্যাটিন আমেরিকা, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, ভারত, শ্রীলংকা ইত্যাদি দেশে গামছা দিয়ে তৈরি পোশাক, ন্যাপকিন ইত্যাদি প্রদর্শন করি। গামছার স্কার্ফ এত জনপ্রিয়তা পায় এটি স্পেনের রানি সোফিয়া এবং আন্তোনিও বান্দেরাসও পরেছেন। বান্দেরাস আমার কাছ থেকে এটি ক্রিসমাস উপহার হিসাবে নেয়। গামছা চুড়ি পরেছেন ম্যাডোনা। এভাবে গামছা তাঁতিদের সঙ্গে আমার জীবন যুক্ত হয়ে যায়। ওরাও আমাকে শতভাগ দেয়, আমিও ওদের শতভাগ দেওয়ার চেষ্টা করি। কারণ ওদের ছাড়া আমি কিছুই নই।'[৯]

সিরাজগঞ্জের গামছা বর্তমানে শুধুমাত্র গা মুছার বস্ত্র নয়। বর্তমান ফ্যাশন জগতে গামছা জায়গা করে নিয়েছে স্বমহিমায়। ফ্যাশন সদা পরিবর্তনশীল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। তারই ধারাবাহিকতায় প্রতিনিয়ত ফ্যাশনে সংযোজিত হচ্ছে নতুন মাত্রা। আর এই মাত্রায় অনন্য সংযোজন গামছা। একটা সময় ছিল যখন গামছা ব্যবহৃত হতো শুধু শরীর মোছার কাজে। কিন্তু বর্তমানে গামছা দিয়ে তৈরি হচ্ছে শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ, ওড়না, টপস, স্কার্ট, ফতুয়া, পাঞ্জাবিসহ নানা ধরনের পোশাক। এসব পোশাকে উঠে আসে বাঙালি ঐতিহ্য, মেলে ধরে বাঙালি তাঁত শিল্পকে। অনেক ডিজাইনার আবার ভিন্ন ধরনের কাপড়ের সঙ্গে গামছার কাপড় যোগ করে তৈরি করছেন ফিউশন। ছেলেদের ফ্যাশনেও নতুন মাত্রা যোগ করেছে গামছা। তৈরি হচ্ছে পাঞ্জাবি, শার্ট, ফতুয়া ও প্যান্টসহ বিভিন্ন পোশাক। শুধু পোশাকেই নয়; গামছা ব্যবহৃত হচ্ছে গয়না, ঘর সাজানোর নানা অনুষঙ্গ, পার্স ও স্যান্ডেলেও। গামছা দিয়ে তৈরি এসব জিনিস বর্তমানে ফ্যাশন প্রিয়দের কাছে খুবই জনপ্রিয়।[১০]

শত শত বছরের ঐতিহ্য এ দেশের 'গামছা'। আজ থেকে প্রায় সোয়া পাঁচ শ বছর আগে লিখিত 'মনসামঙ্গল' কাব্যের বিবাহ উপলক্ষ্যে বেহুলার সাজসজ্জা ও বিবাহ অনুষ্ঠান অংশে গামছার উলেখ পাওয়া যায়। সুকবি নারায়ণ দেব লিখেছিলেন,

'হেট মাথা হইয়া লখাই ডাহিন বামে চায়।
জয়ধরে লখাইর হাতে গামছা জোগায়।।
গামছা লইয়া ঔসদ লাগে মুছিবার।
কন্যা বরে তোলা তুলি হইল সাতবার।।'[৫]

ফলে গামছা যে আমাদের সুদীর্ঘ কালের যাপন অনুষঙ্গ, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

একই কাব্যে গামছার আরো উল্লেখ পাওয়া যায়। ডিঙ্গাডুবির ফলে চাঁদ সদাগর উপকূলে উঠিলে-

'ব্রহ্ম দিজে শুণিয়া চান্দোর বচন।
ভাঙ্গা গামছার অর্দ্ধেক দিল ততক্ষণ।৫

সিরাজউদ্দিন চৌধুরী নামক একজন ভূস্বামী (জমিদার) ১৮০৯ সালের দিকে ভূতের দিয়ার মৌজাকেই সিরাজগঞ্জ নামে নামকরণ করেন। ফলে ভূতের দিয়ার মৌজাই সিরাজগঞ্জ নামে স্থায়ী রূপ লাভ করে। এ নামকরণের ফলে অনুমান করা যায়, সেখানে উৎপাদিত গামছা 'সিরাজগঞ্জের গামছা' নামে পরিচিতি পেতে থাকে; যা বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত বস্ত্র হিসেবে দেশে-বিদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

প্রাচীনকাল হতে দেশে গামছার প্রচলন রয়েছে। তবে, সিরাগঞ্জের নামকরণের ইতিহাস মতে, ১৮০৯ সাল থেকে সিরাজগঞ্জের গামছা ব্যবহার হয়ে আসছে।

ঠ) পণ্যের বাণিজ্যিক এলাকা ঃ

সিরাজগঞ্জের গামছা সমগ্র বাংলাদেশ বিক্রয় এবং ব্যবহার হয়। সিরাজগঞ্জের গামছা স্পেন, ফ্রান্স, ইতালিসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, ল্যাটিন আমেরিকা, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, ভারত, শ্রীলংকা ইত্যাদি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। তাছাড়া, গামছা দিয়ে তৈরি পোশাক, ন্যাপকিন ইত্যাদিও উল্লিখিত দেশে রপ্তানি হচ্ছে।

ড) পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ ঃ

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

ঢ) তথ্যসূত্র ঃ

১। কবিতা 'আমার বাড়ি' পল্লি কবি জসিম উদ্দিন;
২। https://bn.wikipedia.org/wiki
৩। http://bn.banglapedia.org/index.php?title
৪। https://www.newsg24.com/bangladesh-news/146569/
৫। পদ্মপুরাণ (মনসা-মঙ্গল কাব্য), সুকবি নারায়ণ দেব।
৬। ঢাকাই মসলিন, ড. আবদুল করিম (২০১৬), পৃ: ৫৪-৫৫।
৭। বাংলাদেশের তাঁত শিল্প, শাওন আকন্দ (২০১৮), পৃ: ৩২।
৮। বাংলাদেশের তাঁত শিল্প, শাওন আকন্দ, পৃ: ৩৮। Francois Bernier, Travels in the Mughal Empire, A.D.1665-1668.
৯। https://www.jugantor.com/todays-paper/features/out-of-home/৫২৮১৯৬/তাঁতশিল্প-এবং-আমাদের-বিবি-রাসেল
১০। https://protidinerbangladesh.com/feature/43836

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস-সিডিপি শাখা-খ-১৬৮৬/২৩-২৪/শিল্প-২০-০৫-২০২৪-২০২ বই।

LIST OF AGENTS

1. Messrs Book Syndicate,
   157, Government New Market, Dhaka.

2. Messrs Warshi Book Corporation,
   14, Bangabandhu Avenue, Dhaka.

3. Bangladesh Co-operative Book Society,
   150, Government New Market, Dhaka.

4. Messrs K.R. & Co.,
   73, Abul Hassnat Road, Dhaka.

5. Bangladesh Subscription Service,
   64, Purana Paltan, Dhaka.

6. Messrs Mohiuddin & Sons,
   143, Government New Market, Dhaka.

7. Messrs Hasanat Library,
   4, N. S. Road, Kushtia.

8. Messrs Current Book Stall,
   Jessore Road, Khulna.

9. Messrs Current Book Mohal,
   Jalsa Cinema, Jubilee Road, Chittagong.

10. Messrs Khoshroj Kitab Mohal,
    15, Bangla Bazar, Dhaka.

11. Messrs New Front Bipani Bitan,
    New Market, Chittagong.

For official use only

Printed by: Dr. Mohammad Mofizur Rahman, Deputy Director (Deputy Secretary)
Government Printing Press, Tejgaon, Dhaka.
Published by: Md. Nazrul Islam, Deputy Director (Deputy Secretary)
Bangladesh Forms and Publication Office, Tejgaon, Dhaka.